রামুতে গেলে...

নিবিড় চৌধুরী

রামু যেতে হলে প্রথমে আপনাকে উঠতে হবে বাসে। নতুন করে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন হওয়ায় ট্রেনে চড়ে বসলেও পারেন। রামু যাবেন কেননা রামু দেখার মতো। ঐতিহাসিক, শৈল্পিক ও নৈসর্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলকে আলাদা করা যায় অন্যান্য দর্শনীয় স্থান থেকে। যদি আপনার পড়া থাকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলানাপোতা আবিষ্কার' বা শোনা থাকে জন ডেনভারের 'কান্ট্রি রোড' তাহলে এই ভ্রমণের একটা দ্যোতনা পাবেন। রামুতে এলে রিকশা সহযোগে প্রথমে আপনি চলে যাবেন 'রামকোট' বা 'রাংকুটের' দিকে। রামকোট হলো সনাতনীদের আর রাংকুট বৌদ্ধদের। নাম দুই হলেও আদতে স্থান এক।

রামকোট/রাংকুট: রাজা দশরথের ছেলে-বৌ যখন ১৪ বছরের বনবাসে, তখন সীতাকুণ্ড, বান্দরবান হয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দে এই পঞ্চবটি বনে এসেছিলেন রাম-সীতা-লক্ষণ। এমনটাই মনে করেন কিছু গবেষক ও স্থানীয়রা। কথিত আছে, এখানে সীতার ব্যবহার্য্য অনেক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। সীতাস্মরণে প্রতিবছর এখানে কয়েকদিন ব্যাপী 'সীতামেলা' হয়। রামায়ণে উল্লিখিত 'পঞ্চবটি বনে'র কয়েকটা বৃক্ষও চোখে পড়ে এখানে। এখানে যে দুর্গা পুজা হয় সেই দুর্গা বিসর্জিত হয় পরের বছর। হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা জন্মান্তরবাদী। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে গৌতম বুদ্ধ পারমী পূরণের জন্য যে পাঁচশত জন্ম নিয়েছিলেন তার মধ্যে একবার 'রাম' নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং দেখা যায়, রামায়ণের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। হতে পারে রাম থেকে রামকোট নামের উৎপত্তি। বৌদ্ধজাতকে আরও পাবেন মহাভারতের খণ্ড কাহিনী। এইসব মিথলজি, মিথিক্যাল চরিত্র আরও জানতে চাইলে পড়তে পারেন বৌদ্ধজাতক, রামায়ন, মহাভারত। এ তো গেল রামকোটের কথা। এবার তার পাশে রাংকুটে ঢুকতে প্রথমে আপনাকে অভিবাদন জানাবে ১৪০০ বছরের পুরানো এক বিশাল বুড়ো অশ্বত্থবৃক্ষ। এই গাছঠাকুর চারদিকে মেলে দিয়েছেন তার শাখা-প্রশাখা। গৌতম আজকের বুদ্ধগয়ার যে বোধিমূলে বসে ৬ বছর একটানা ধ্যান করেছিলেন এবং পরে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন এই বোধিতরু হলো সেই বোধিবৃক্ষের উত্তরসূরি। এখানে পাখিরা ফল খেয়ে উড়ে যায়। আর পথিকেরা জিরায়। পাশে দেখবেন ত্রিপিটক হাতে সম্রাট অশোকের মুর্তি। প্রায় ২২০০ হাজার আগে তিনি গৌতমের বক্ষাস্থি বা ধাতু দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই রাংকুট। বক্ষাস্থির পালি অর্থ হলো 'রাং'। রাং থেকে রাংকুটের উৎপত্তি, এখানকার বৌদ্ধরা। প্রতিবছর চুরাশি হাজার বুদ্ধের পূজা হয় এখানে। চুরাশি হাজার বুদ্ধ হলো মারবিজয়ী সিদ্ধার্থের নির্বাণ পরবর্তী পুড়ানো শরীরের চুরাশি হাজার অস্থি। সনাতনী আর বৌদ্ধদের কাছে এই তীর্থস্থান অত্যন্ত পবিত্র। এখানে এলে আদতেই শরীর জুড়ায়। সবসময় পুজারি ও দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা যায় এখানে। এছাড়াও রামকোট ও রাংকুটের মাঝে বিদেশি অনুদানে তৈরি 'জগৎজ্যোতি শিশু অনাথ আশ্রমের' নজরকাড়া শৈল্পিক স্থাপত্য আপনার নয়ন জুড়াবে।

নারিকেল বাগান: রামকোট থেকে আরেকটু সামনে এগিয়ে চলে যাবেন বিশাল নারিকেল বাগান দেখতে। ভেতরে ঢুকে দেখবেন সারি সারি নারিকেল গাছ। যতো ভেতরে ঢুকবেন ততোই দেখবেন ঘন হয়ে আসছে নারিকেল বৃক্ষ। দেখবেন পাহাড়ের ওপারে পাহাড়। নারিকেলে ফাঁক দিয়ে মেঘে ঘষা খাওয়া পাহাড় আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। ওদিকে ভুলেও পা বাড়াবেন না। কেননা সামনেই সব রাস্তা একেবারে খাদের দিকে নেমে গেছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেন: নারিকেল বাগানে যাওয়ার পথে চোখে পড়ে রামু ক্যান্টনমেন্ট। জঙ্গল সাফ করে কয়েক বছর আগে এখানে সেনাবাহিনী স্কুল ও কলেজও গড়েছে। জঙ্গল কেটে বিশাল এলাকাজুড়ে তৈরি করা নতুন বোটানিকেল গার্ডেনেও ঢুঁ মারতে পারেন সময় পেলে। চারদিকে ফুটে আছে অসংখ্য পরিচিত অপিরিচিত বুনো ও চাষ করা ফুল। একটু পাহাড়ি ও গা ছমছমে এই বোটানিকেল গার্ডেন। গাছেদের ছায়া ও ঘ্রাণ আপনার দিকে ঝুঁকে এসে ভয় দেখাবে নিশ্চিত।

শত ফুটের শায়িত বুদ্ধ: এ অধ্যায় শেষে বাঁকখালি নদীর ওপর ব্রিজ দিয়ে টমটম বা রিকশায় চড়ে ফিরে আসুন চৌমুহনী। ফেরার পথে তেমুহনিতে দেখবেন 'কক্স সাহেবের বাংলো'। হিরাম কক্স থেকে কক্সবাজার নামের উৎপত্তি। ব্রিটিশ শাসনের সময় প্রশাসনিক কাজে রামুতে এলে তিনি এই

রামকোট/রাংকুট

বাঁকখালী নদী

বাংলোতে থাকতেন। চৌমুহনী হলো রামুর প্রাণকেন্দ্র। এখানে আপনি দিনের যেকোনো খাবারই পাবেন। খাবার দাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ুন মিড়াছড়ির উদ্দেশে। এখানে বছর দশেক আগে নির্মিত এক শ হাত শায়িত বুদ্ধমূর্তির পাশে আপনিও শুয়ে পড়ুন। এছাড়া মিঠাছড়িতে আছে তাড়িকোটা (তাড়িবাগান/ পামবাগান)। স্থানীয় লোকজন একে তাড়িকোটা বলে। এখন রেললাইনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে যা অনেক কমে গেছে। সুস্বাদু তাড়ি একবার চেখে দেখতে পারেন। এই গ্রামের অর্থনীতি একসময় তাড়িনির্ভর ছিল। তাড়ি কেবল নেশা হিসেবে নয়, বিবিধ রোগ সারাতে ও চিনি তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। বিশাল এলাকা জুড়ে চাষ হয় পাম গাছ। সমুদ্রের নোনা পানি খাল দিয়ে ঢুকে পড়ে তাড়ি ক্ষেতে। মাঝেমধ্যে বিষাক্ত সাপ চোখে পড়বে ক্ষেতের ভেতরে। ভোর থেকে চাষিরা বাঁশের চোঙা হতে তাড়ি সংগ্রহ করেন। মিঠাছড়ির ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে ফাড়িখাল নদী। এই নদী বিবিধ সুস্বাদু মাছের উৎস।

লাওয়ে জাদি: রামু হলো প্যাগোডা প্রধান জনপদ। কিছু দূর পরপর রয়েছে বৌদ্ধ মন্দির। সেখানে সৌম্যকান্তি গৌতম বুদ্ধ সিংহশয্যায় বা পদ্মাসনে ধ্যান সমাধিতে বসে থাকেন। রামু আগে রাখাইন অধ্যুষিত। মিয়ানমার কাছাকাছি হওয়ায় এই জনপদ আগে আরাকান শাসকদের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামুর ঐতিহাসিক যা কিছু তার পেছনের অবদান কিন্তু রাখাইনদের। রাখাইন জনগোষ্ঠী তখন এখানে দিঘি, স্কুল, রাস্তা, প্যাগোডা, জাদি নির্মাণ করেন মানুষের সুবিধার্থে। ১৮শ শতকে কাউয়ারখোপের এক বৃহৎ পাহাড়ের উপরে নির্মাণ করা হয় সুউচ্চ জাদী যা লাওয়ে জাদি নামে পরিচিত। সবুজ বৃক্ষঘেরা খাড়া পাহাড় বেয়ে দেখতে পারেন এই জাদী। যেতে হবে রামু থেকে, রিকশা বা টমটমে। হেঁটেও যেতে পারেন। এখানে বুনোগন্ধ মাখা পরিবেশে আপনি নিজেকে হারিয়ে খুঁজবেন। তবে সংস্কারের অভাবে এই জাদির অস্থিত্ব হুমকির মুখে।

বাঁকখালী নদী: লাওয়ে জাদির নিচে বয়ে গেছে বাঁকখালি নদী। তার তীরে গড়ে উঠেছে রাজারকুল গ্রাম। রাজা নেই, তবে বালিকারা যেহেতু দুরন্ত প্রেমিকা আপনিও খুঁজে পেতে পারেন কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত। নদীর দু'পাশে আখ, বেগুন, মুলা, লেবু, টমেটো, বরবটি, শিম হরেক সবজির ক্ষেত। রাজারকুল গ্রামের যতই গভীরে ঢুকবেন ততই হিমধরা ভয় আপনাকে পেয়ে বসবে। বিশেষ করে, সন্ধ্যায় গাছের ছায়ারা ভৌতিক আকার ধারণ করে। বাঁকখালি তীরে বসে রাজারকুলে একরাত কাটালে একটা ঘোর পেয়ে বসবে। যেহেতু আপনি শহর ছেড়ে গ্রাম দেখতে এসেছেন এবং রাজারকুল আপনাকে ফিরিয়ে দেবে আদর্শ গ্রামের অনুভূতি। রামুর সবচেয়ে উল্লেখ্য স্থান বাঁকখালি। বর্ষাকালে এই নদী যেমন ভাসিয়ে দেয় দু'পাশের গ্রাম তেমনি অন্যান্য ঋতুতে এই নদী অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে রামুর। দূরের পাহাড় থেকে কাঠুরেরা নদীর স্রোত বরাবর গাছ-বাঁশ ভাসিয়ে দিয়ে নিয়ে আসে পাশের ফকিরাবাজারে। এই নদীতে বৌদ্ধদের জাহাজ ভাসা উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তিতে জলকেলি, হিন্দুদের প্রতিমা বিসর্জন, নৌকা বাইচ, আরও কতো গ্রামীণ মেলা জমে! সাপ্তাহিক বাজার দেখার জন্য আপনি যেতে পারেন ফকিরাবাজার বা গর্জনিয়ায়। এই দুই বাজারে মিলবে না এমন জিনিস খুব কম। তাছাড়া ফকিরাবাজারের ভেতর যে শিরিষ গাছ আর রেইন ট্রিগুলো আছে, তাদের বর্তমান আয়ুষ্কালও ১০০-২০০ বছরের কম হবে না। ফকিরাবাজারের কাছেই রাখাইনদের তৈরি কিয়াং (প্যাগোডা)। রাখাইনদের নির্মিত কিয়াংয়ের স্থাপত্য শৈলী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এসব দেখার জন্য দূর-দুরান্ত থেকে ছুটে আসেন দেশি বিদেশি পর্যটক। রামুতে প্রায় ২০-২১টি বৌদ্ধমন্দির বা কিয়াং দেখতে পারেন। কয়কটি মন্দির ৩০০-৪০০ বছর পুরানো। তেমনি একটি কিয়াং হলো লামারপাড়া বৌদ্ধমন্দির। এই বৌদ্ধমন্দিরের ভেতর আছে ৩০০ বছরের বেশি পুরনো বৃহৎ দুই পিতলের ঘণ্টা।

রাবার বাগান: সোনাইছড়ি আর নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবান জেলার মধ্যে পড়লেও কক্সবাজার জেলার রামুর সঙ্গেই যেন এই দুই জনপদের মানুষ, সংস্কৃতির সম্পর্ক বেশি। দুইটি স্থানই দেখার মতো। রামু থেকে চান্দের গাড়ি ভাড়া করে বা লোকাল ট্রিপে চড়ে আপনি ঘুরে আসতে পারেন নাইক্ষ্যংছড়ি। অবশ্য মোটর রিকশা ও টমটমের আধিক্যে চান্দের গাড়ি এখন চোখে পড়ে না বললেই চলে। নাইক্ষ্যংছড়ি যেতে পথে আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে রাবার বৃক্ষেরা। তেমনি সোনাইছড়ি, পাহাড়ী অধ্যুষিত বান্দরবানের এক উপজেলা। সপ্তাহন্তে এখানকার মানুষ ১৬-১৭ কিলোমিটার পাহাড়ি উঁচু নিচু পথ হেঁটে বাজার করতে নামে ফকিরাবাজার। সাথে নিয়ে আসে পাহাড়ে চাষ করা ফসল আর মধু। সোনাইছড়িতে ঘরে ঘরে শুকর প্রতিপালন ও চোলাই মদ উৎপাদিত হয়। আছে শত মিটার উঁচু ভগবানটিলা নামের এক পাহাড়। পাহাড়ে হরেক রঙের পাখির অজস্র বাসা। তার নিচে বসে থাকে পাহাড়ী এক বর্ষীয়ান বুড়ি। পথিক দেখলে পানি পান করায়। ভগবান টিলার নিচে বয়ে গেছে ঝিরিঝিরি ছড়া। সেই ছড়ার জল ঠান্ডা মিঠা। পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হলে এই জল আপনার তৃষ্ণা মেটাবে। হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে বা ছোট কাপড় পরে পাহাড়ি যুবক আর পাহাড়ি নারীরা সেইসব জায়গায় স্বপ্ন ও ফসল বুনে। মিঠাছড়ির পাশে বা লোকাল ভাড়ায় চান্দের গাড়িতে চড়ে গর্জনিয়া যাওয়ার পথে রামুতে দেখতে পারেন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাবার বাগান। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই প্রশ্নটার সম্মুখীন তো আপনি হয়েছেন অনেকবার! ভেতরে ঢুকতেই দেখবেন উড়োচুলের বালিকারা এখানে রাবার বিচি বস্তাবন্দি করছে। কেউ রাবার তুলছে। কেউ কাটছে কাঠ। বেশিদূর যাওয়ার কথা চিন্তা ভুলেও করবেন না। রাস্তা হারিয়ে হাতিমামার কবলে পড়তে পারেন।

পরিশেষে: কক্সবাজার জেলার অন্যতম উপজেলা রামু। যার দূরত্ব প্রায় ১৭ কিলোমিটার। এখানকার জীবনাচার মিশ্র। রামুর পূজা পার্বণের রীতি বহন করছে তার ইতিহাসকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পর্যটক হিউয়েন সাং, গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমির পুস্তকে পাবেন রামুর কথা। রামু হয়ে আপনি যেতে পারেন কক্সবাজার সদর। কক্সবাজারে মনভোলানো দেখার কতো কী পাবেন! সে তো আপনি নিজেই জানেন। ঢাকা থেকে হোক বা চট্টগ্রাম থেকে, গাড়িতে গেলে সরাসরি আপনি নামতে পারবেন রামুতে। ট্রেনে হলে নামতে হবে কক্সবাজার স্টেশনে। সেখান থেকে টমটমে জনপ্রতি ভাড়া ২০ টাকা দিয়ে রামু বাইপাস বা চৌমুহনী নেমে আপনি ঘুরাঘুরি শুরু করতে পারেন। এখানের সব দর্শনীয় স্থান কাছাকাছি হওয়ায় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে টমটম/রিকশায় ১০ থেকে ৫০ টাকা ভাড়া লাগবে। এখানকার খাবার বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাজারে সামুদ্রিক মাছ পাবেন। রয়েছে পাহাড়ি খাবারও। তবে এসবের জন্য বিশেষ কোনো খাবারের দোকান নেই। তবে দুয়েক জায়গায় 'মুন্ডি' নামে রাখাইনদের তৈরি এক বিশেষ খাবার খেতে পারবেন।

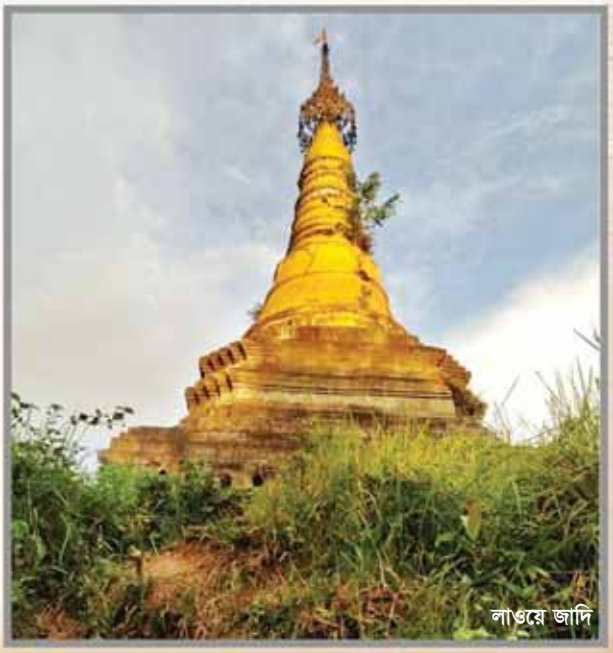
লাওয়ে জাদি